মডিউল-২১

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-4

কোর্স নাম : কোর্স নাম -অলংকার, শাক্তপদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাংলা প্রুফ সংশোধন

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ : শব্দালংকার

গঠন

২১.১ উদ্দেশ্য

২১.২ প্রস্তাবনা

২১.৩ মূলপাঠ

- **২১.৩.১ অনুপ্রাস**
- **২১.৩.২ যমক**
- **২১.৩.৩ শ্লেষ**
- **২১.৩.৪ বক্রোক্তি**

২১.৪ সারাংশ

২১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২১.৭ উত্তর সংকেত

২১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে —

- আপনি বাংলা কবিতার উচ্চারণ থেকে ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদন করার সামর্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারবেন।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনির প্রয়োগে বা সমাবেশে কবির দক্ষতা বিচার করার ক্ষমতা ক্রমশ আপনার মধ্যে তৈরি হবে।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনিপ্রয়োগের নানারকম কৌশল বুঝে নেওয়া ক্রমশ আপনার পক্ষে সহজ হবে।

২১.২ প্রস্তাবনা

একক ৩৮ থেকে জানলেন বাংলা কবিতার অলংকারের দুটি মূল বিভাগের কথা। এর প্রথমটি শব্দালংকার। এ অংলকার তৈরি হয় শ্রোতার কানে, কবিতার উচ্চারণ থেকে মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অলংকারের এই বিভাগটির পরিচয় আপনার কাছে তুলে ধরা হল। কিছু কিছু সূক্ষ্ম কৌশলগত পার্থক্যের কারণে শব্দালংকারেও যে ধরনের বৈচিত্র তৈরি হতে পারে, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাও দেখানো হল।

২১.৩ মূলপাঠ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ — একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। 'শব্দালংকার'-এর 'শব্দ' তাহলে কোন অর্থে? চারটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ, 'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়' — এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকার — শব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও দুটি উদাহরণ থেকেও তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

আটপণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

এখানে 'চিনি' শব্দটি দুটি ছত্রে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম 'চিনি' এক ধরনের মিষ্টি, দ্বিতীয় 'চিনি'-র অর্থ 'জানি' বা 'বুঝি'। একই শব্দ 'চিনি' দুবার উচ্চারিত হল দুটি পৃথক অর্থ নিয়ে। 'চিনি'-র পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ কানে মধুর লাগে, কানকে তৃপ্ত করে। এই মাধুর্যের সঙ্গে একটুখানি চমক লাগে 'চিনি' শব্দটি দুবার দুটি পৃথক অর্থ পাচ্ছে বলে। একই অর্থে দুবার উচ্চারণে ওই আস্বাদটুকু পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যায় না যদি বলি — 'তোমাকে ত চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে!' অথবা 'ছেলেটা চিনি চিনি করে চেঁচায় শুধু, বেশি খেতে পারে না।' 'চিনি' শব্দের দুটি পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ থেকে যে মাধুর্য তৈরি হল তা-ও শব্দালংকার। এ অলংকার তো 'চিনি' শব্দটাকে ঘিরেই তৈরি হল এবং 'শব্দ' এখানে Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, Sound বা ধ্বনি নয়।

তৃতীয় উদাহরণ,

'পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে মনের মতো

একটি বর দাও।'

'বর' শব্দটি একবার মাত্র উচ্চারিত হল উদ্ধৃত বাক্যে। এতে চমকাবার মতো কিছুই থাকত না, যদি 'বর' সাধারণভাবে একটিমাত্র অর্থই বোঝাত। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতা জানেন, 'বর'-এর দুটি অর্থ — 'আশীর্বাদ' আর 'স্বামী'। কুমারী মেয়ে ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে পারে, 'মনের মতো' স্বামীও চাইতে পারে। 'বর' শব্দটি যখন দুটি অর্থের ইঙ্গিত নিয়ে শ্রোতার কানে বেজে ওঠে, তখন সেই উচ্চারণে তৈরি হয় চমক আর মাধুর্য। চমকসহ এই মাধুর্যই শব্দালংকার। এ-অলংকারের কেন্দ্রে আছে 'বর' শব্দটি, একটিমাত্র উচ্চারণে দুটি অর্থ নিয়ে। 'শব্দ' এখানেও Word, Sound নয়।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি (Sound) হতে পারে, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিও (Word) হতে পারে? ধরে নেওয়াই যায়, ওপরের তিনটি উদাহরণ তো সে-কথাই বলে। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় উদাহরণ অন্য কথাও বলে এবং সেই কথাই চূড়ান্ত। ধ্বনি আর শব্দের (Sound আর Word) এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত আছে আর একটি কথা। সেটি হল 'অর্থে'র ভূমিকা। শব্দ Word যখন অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, তখন শব্দে ধ্বনিও আছে, অর্থও আছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণের 'চিনি' আর 'বর' যখন শব্দালংকার সৃষ্টি করে, তখন ওই শব্দদুটির ধ্বনি আর অর্থই অলংকার-সৃষ্টির কাজ করে যায়। 'চিনি'র দুবার উচ্চারণে দুটি অর্থ আর 'বর'-এর একবার উচ্চারণে দুটি অর্থ — এই অর্থের চমকেই তো এদের অলংকার। তবু এরা অর্থালংকার নয়, শব্দালংকারই। এর কারণ, উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি বা ধ্বনিগুচ্ছই শ্রোতার কানে মাধুর্য সঞ্চার করে, অলংকার তৈরি করে। আর, সে অলংকার-সৃষ্টিতে কেবল সহায়তা করে একই ধ্বনিগুচ্ছের দুটি অর্থ — ধ্বনির মধ্যে চমক জাগিয়ে। অতএব, 'চিনি' আর 'বর'-এর অলংকার নির্মাণে ধ্বনি দেয় মাধুর্য, অর্থ দেয় চমক। ধ্বনিমাধুর্যই তো শব্দালংকার, অর্থ তার সহায়কমাত্র। ধ্বনির এখানে মুখ্য ভূমিকা, অর্থ নিতান্ত গৌণ। অন্যদিকে, প্রথম উদাহরণের অলংকার নির্মাণে একমাত্র ধ্বনিরই ভূমিকা (ক-ধ্বনি)।

ওপরের তিনটি উদাহরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই সত্যটিই বেরিয়ে এল — শব্দালংকার মূলত ধ্বনি নির্ভর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে অর্থে সহায়তা নিতে হয়। এ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, শব্দের (Word) উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' কখনো বর্ণধ্বনি (প্রথম উদাহরণে), কখনো শব্দধ্বনি (দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণে)। চতুর্থ উদাহরণের সাহায্য নিয়ে দেখব, 'শব্দ' কখনো কখনো বাক্যধ্বনি।

যেমন,

'রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো?'

--- এখানে দুটি বাক্য। দুটি বাক্যেরই গোটা শরীরে ছড়ানো রয়েছে এই ধ্বনিগুলি : 'অজনী-অন্ধা-আসবি-আলো'। অতএব এটি বাক্যধ্বনি, এবং একই বাক্যধ্বনির দুবার আবর্তনে শব্দালংকার।

সুতরাং শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই — বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বাক্যধ্বনি, যা-ই হোক ('শব্দধ্বনি'র 'শব্দ' অবশ্যই Word)। তবে, শব্দালংকার ধ্বনিরই অংলকার। কবিতার একটি স্তবকের উচ্চারণ

থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (Word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগ বা সমাবেশের কৌশলে মধুর শোনায়, এবং সেই মাধুর্য যদি শ্রোতার কানে তৃপ্তিদায়ক ঠেকে, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার।

বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ-পরিমাণের দিক থেকে প্রথম চারটি শব্দালংকার — অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ আর বক্রোক্তি।

২১.৩.১ অনুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বা সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার।

(একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস।)

বৈশিষ্ট্য :

১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-ষ-স, ণ-ন) দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত (ন্ব-ন্ব, ন্ধ-ন্ধ) বা বিযুক্ত (শিষের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।

৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাক্-কাব্) উচ্চারণ।

৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।

৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারন।

৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যক।

অনুপ্রাস অলঙ্কারের প্রকারভেদ

প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের —

(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস (বৃত্তি + অনুপ্রাস); (খ) ছেকানুপ্রাস (ছেক + অনুপ্রাস); (গ) শ্রুত্যনুপ্রাস (শ্রুতি + অনুপ্রাস)।

প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের —

(ঘ) আদ্যানুপ্রাস (আদ্য + অনুপ্রাস); (ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস (অন্ত্য + অনুপ্রাস); (চ) সর্বানুপ্রাস (সর্ব + অনুপ্রাস)।

বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রাস অলঙ্কারের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যানুপ্রাস।

১. একই ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ —

বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনের 'ব' দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

২. সমব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ —

জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে। — শ্যামাপদ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'জ' 'য' দুবার উচ্চারিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩. একই ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ —

চলচপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জন 'চ'-এর ছয়বার এবং 'র'-এর চারবার উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

৪. সমব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ —

শরতের শেষে সরিষা রো।— খনার বচন

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'শ' 'ষ' 'স' পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

৫. ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক) —

(i) করবী দিল করবীমালে ঢাকি। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা: 'করবী' আর 'করবী' শব্দদুটিতে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বর'-এর বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে দুবার — প্রথমবার 'বরী' এবং দ্বিতীয়বার 'রবী'। 'ব-র'-এর বিন্যাস বদলে যাওয়ার (বরী > রবী)-এর উচ্চারণ ক্রম অনুসারে হয়নি, হয়েছে স্বরূপ অনুসারে। অতএব, করবী-করবী উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

(ii) বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

সংকেত : বাক্য > কাব্য।

৬. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ —

(i) কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী। — জগদানন্দ

সংকেত : 'ঞ্-জ'-এর যুক্ত উত্তারণ (ঞ্জ) তিনবার।

(ii) দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়। — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : একই স্বরধ্বনিসমেত 'ন্-ত্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (আন্তে) তিনবার।

৭. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ —

(i) ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া। — নজরুল

সংকেত : 'লক'-এর তিনবার উচ্চারণ স্বরধ্বনিসমেত ('লোক')।

(ii) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

সংকেত : 'কল'-এর চারবার উচ্চারণ (স্বরসাম্য নেই — 'কল', 'কিল' - 'কুল' - 'কুল')।

(খ) ছেকানুপ্রাস ঃ

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস। (‘ছেক’ শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পন্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ —

উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে। — মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘ম্-ব্’-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) হয়েছে দুবার (কলম্ব, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘ন্-ধ্’ -এর যুক্ত উচ্চারণ (ন্ধ) দুবার।

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বারসাম্য থাক বা না থাক) —

একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘শ-ষ-র’-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে ‘শিষের’ ও ‘শিশির’ শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয়, এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য: ‘শ-ষ-র’ এবং ‘শ-শ-র’ ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। ‘শ-ষ’-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

৩. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত এবং বিযুক্ত উচ্চারণ —

(i) মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘প-ঞ্-জ-র’ ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হয়েছে ‘পঞ্জর’ ও ‘পিঞ্জরে’ শব্দদুটিতে। এখানে ‘প-র’ ব্যঞ্জনদুটির উচ্চারণ বিযুক্তভাবে হলেও ‘ঞ্-জ্’-এর উচ্চারণ হয়েছে যুক্তভাবে, স্বরধ্বনির সাম্যও এখানে নেই (পঞ্জর-পিঞ্জরে > অ-অ-অ > ই-অ-এ)। কিন্তু, ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থাকার কারণে এখানে ছেকানুপ্রাসই হয়েছে।

(ii) আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের। — প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘র্-ম-র’ ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে নিঃসন্দেহে (প্রথম উচ্চারণ ‘কর্মের > ‘র্মের’, দ্বিতীয় উচ্চারণ ‘ঘর্মের > ‘র্মের’)। কিন্তু লক্ষণীর, ‘র্ম’-এর উচ্চারণ যুক্ত আর ‘মের’-এর উচ্চারণ ‘এ’ স্বরধ্বনির দ্বারা বিযুক্ত।

(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস :

সংজ্ঞা : বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস।

(একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শ্রুতিতে বা শুনতে একইরকম। শ্রুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ —

(i) বাতাসে বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

ব্যাখ্যা : ‘গ-ঘ’ ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও তারা বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনুয়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে ‘বেগে’ আর ‘মেঘে’ শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

(ii) চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে। — রবীন্দ্রনাথ

সংতেক : ‘ক-খ’ (কণ্ঠে উচ্চারিত) -এর শ্রুত্যনুপ্রাস ‘চিকন’-‘লিখন’-‘লিখন’ শব্দটিতে

(iii) নিবারণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘ব-ভ’ (ওষ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস ‘নিরাবরণ’ আর ‘নিরাভরণ’ শব্দদুটিতে।

২. একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ —

ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ‘ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত’ অংশে ‘দ-ন্-ধ-থ-ত’ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ মূলত চারটি ধ্বনির — ত-থ-দ-ধ। এদের উচ্চারণস্থান দন্তমূল। ধ্বনিগতভাবে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ পৃথক হলেও শ্রুতিতে এরা একইরকম। সেই কারণে, মিলিতভাবে পাঁচবার উচ্চারিত হয়ে এরা শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ঘ) আদ্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা: পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই। — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : চরণের আদিতে ‘বড়ো’-‘জড়ো’ শব্দে ‘আড়ো’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে অদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে ‘নিত্য’ এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে ‘চিত্ত’ — এই দুটি শব্দে ‘ইত্ত’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ‘ইত্ত’ ধ্বনিগুচ্ছে আছে স্বরধ্বনি ‘ই-অ’ সমেত ব্যঞ্জনধ্বনি ‘ত্ত’ (ই-ত্-ত্-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

(ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমন কী পঙক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) অজানু গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে 'চমকি' আর দ্বিতীয় চরণের শেষে 'থমকি' — এই দুটি শব্দে 'অমকি' ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত 'ম্-ক্' ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্ত হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ii) আমি নাব মহাকাব্য সংরচনে। — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : প্রথম দুটি পর্বের শেষে 'আর্ব' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

মন্তব্য : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ব্-ব'-এর ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থেকে ছেকানুপ্রাসও হয়েছে।

(i) তবে
একদিন কবে — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : এ উদাহরণে আছে দুটি পঙক্তি (line)। এর কোনোটিই চরণ নয়, পদ বা পর্বও নয়। এদের শেষে 'অবে' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

('বলাকা' কাব্যে এ-ধরনের কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পঙ্ক্তি সাজিয়ে পঙ্ক্তিশেষে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করে গেছেন।)

(চ) সর্বানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল 'গগনে-চরণে', দ্বিতীয় শব্দযুগল 'ছড়ায়ে-জড়ায়ে' এবং তৃতীয় শব্দযুগল 'এলোচুল-বনফুল' — এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে 'অঅনে', 'অড়ায়ে' এবং 'উল' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(ii) সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা। — যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : 'অন্ধ্যা', 'উকের', 'ঔরবী', 'আশা' ধ্বনিগুচ্ছের পুরনাবৃত্তি।

২১.৩.২ যমক

সংজ্ঞা : একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার।

(ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।)

বৈশিষ্ট্য:

১। ধ্বনিগুচ্ছে স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির

প্রয়োগ হতে পারে। যেমন — রবি-রবী, বঁধু-বধূ, ঋণী-রিণী, জেতে-যেতে, আশা-আসা।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে। যেমন — 'ধানের শীষে আগুনের শীষ' যমক (শীষ-শীষ), কিন্তু 'ধানের শিষের উপরে শিশির' অনুপ্রাস (শিষের-শিশির — স্বরধ্বনির পরিবর্তন), 'পূরবীর রবি' যমক (রবী-রবি), কিন্তু 'পূরবীর ছবি' অনুপ্রাস (রবী-ছবি — ব্যঞ্জনের পরিবর্তন)।

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস-ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন — 'যৌবন বন' যমক, কিন্তু 'যৌবন নব' অনুপ্রাস।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন, 'সৌরভ-রভসে'। এখানে 'রভ' ধ্বনিগুচ্ছ দুবারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব, এটি যমক নয়, অনুপ্রাস।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

প্রয়োগ-বৈচিত্রের দিক থেকে যমক দু-রকমের —

(ক) সার্থক যমক; (খ) নিরর্থক যমক

প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক দু-রকমের —

(গ) আদ্যযমক; (ঘ) মধ্যযমক; (ঙ) অন্ত্যযমক; (চ) সর্বযমক।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

(ক) সার্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ :

১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ —

(i) কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার। — মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'কীর্তিবাস' দুবার উচ্চারিত। প্রথম 'কীর্তিবাস' এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল বানানে লেখা, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(ii) টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস বার্নিস?

দাম চাস্? আজ নয়, মঙ্গল-বার নিস্।   — উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সংকেত : 'বার্নিস' (চকচমে করার জন্য প্রলেপ) আর 'বার নিস্' (ওই দিন নিয়ে যাস্) একই শব্দ না হলেও উচ্চারণে এক, অথচ অর্থে ভিন্ন।

২. সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ —

(i) যেতে নারি জেতে নারী আমি হে   — ঈশ্বর গুপ্ত

ব্যাখ্যা : 'যেতে নারি' 'জেতে নারী' — এই দুটি শব্দযুগল সমধ্বনিযুক্ত, একই শব্দযুগলের পুনরাবৃত্তি নয়। 'জেতে-যেতে' শব্দদুটিতে জ-য সমব্যঞ্জন, আবার 'নারি-নারী' শব্দদুটিতে ই-ঈ সমস্বর। এই সমস্বর আর সমব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারিত শব্দযুগল উচ্চারণে এক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে — 'যেতে নারি' অর্থ 'যেতে পারি না', 'জেতে নারী' অর্থ 'জাতিতে স্ত্রীলোক'। অতএব, এটি সার্থক যমকের উদাহরণ।

(ii) তিনখানা নোট আনে সে 'দশ টাকার'
কিছুতে বুঝিতে পারি না দোষটা কার   — রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'দশ টাকার' (অর্থমূল্য) আর 'দোষটা কার' (কার দোষ)। 'অশ্ (দশ) আর 'ওষ্' (দোষ) সমধ্বনিযুক্ত (অ-ও সমস্বর, শ-ষ সমব্যঞ্জন) দুটি শব্দযুগল। এদের উচ্চারণ এক, অর্থ আলাদা।

(খ) নিরর্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ :

(i) যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।   — জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বন' প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে 'যৌবন' শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ 'বন' পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল 'অরণ্য'। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।   — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'রবি' ধ্বনিগুচ্ছ 'পূরবী' শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। 'রবি' স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। 'রবী' আর 'রবি' মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (র-ব), সমস্বরধ্বনি 'ঈ' আর 'ই'-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

(গ) আদ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।   — ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : 'ভারত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ 'কবি ভারতচন্দ্র রায়' অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ 'ভারতবর্ষ' অর্থে।

অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ধৃত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

(ঘ) মধ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা। — ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : প্রথম 'তরি' অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় 'তরি' অর্থ পার হই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

(ঙ) অন্ত্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে একটি বা পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ :

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়। — জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'হয়' চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে — প্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ 'হয়ে যায়'। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

(চ) সর্বযমক :

সংজ্ঞা : একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বযমক।

উদাহরণ :

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণে 'কান্তার' অর্থ বনভূমি, 'আমোদ' অর্থ সৌরভ, 'কান্ত' অর্থ বসন্তকাল আর 'সহকারে' অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে 'কান্তার' অর্থ প্রিয়তমার, 'আমোদ' অর্থ আনন্দ, 'কান্ত' অর্থ প্রিয়তম, 'সহকারে' অর্থ সঙ্গে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ — বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থ — প্রিয়তমের সঙ্গলাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

২১.৩.৩ সংশ্লেষ (শব্দশ্লেষ)

সংজ্ঞা : একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার।

(একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

প্রকারভেদ

বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের —

(ক) অভঙ্গ শ্লেষ (খ) সভঙ্গ শ্লেষ।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

(ক) অভঙ্গ শ্লেষ :

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গ শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে। — মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত না হবার যে অবদান রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে 'মধু' শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন। প্রথম অর্থ 'কবি মধুসূদন দত্ত', দ্বিতীয় অর্থ 'মউ'। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

(i) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ। — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ষাট-বছর পেরিয়ে যাওয়া কবি তাঁর আয়ুষ্কার ফুরিয়ে আসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূরবী' আর 'রবি' শব্দ দুটি দুটি করে অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'পূরবী'র একটি অর্থ কবির নিজের লেখা 'পূরবী' কাব্য, আর একটি অর্থ 'সূর্য'। দুটি শব্দেরই দুটি করে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে শব্দদুটিকে না ভেঙে এবং একবার মাত্র উচ্চারণ করে। অতএব, এখানকার অলংকার অভঙ্গ শ্লেষ।

মন্তব্য : 'পূরবী' আর 'রবি' শব্দের শ্লেষ গোটা বাক্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্যটির প্রথম অর্থ, 'পূরবী-কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষ হয়ে আসার করুণ ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে।' দ্বিতীয় অর্থ, 'পূরবী রাগিণীর করুণ সুরে বীণা বাজছে সূর্যাস্তের মুহূর্তে'। অন্যদিকে, 'পূরবী'র নিরর্থক অংশ 'রবী' আর সার্থক 'রবী' — এই দুটি শব্দ শব্দাংশ দিয়ে নিরর্থক যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

(খ) সভঙ্গ শ্লেষ :

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গ শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরনি, ভুলে যাবে তার মানে।

ব্যাখ্যা : 'রোগশয্যায়' কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের প্রথম চরণে 'মূলতান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ 'সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ' — এটি অখন্ড 'মূলতান' শব্দেরই অর্থ। 'মূলতান' শব্দটিকে 'মূল' আর 'তান' এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই — 'বিশ্ববীণার মূল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়তধ্বনিত হচ্ছে।' প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ 'মূলতান' শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

অপরূপ রূপ কেশবে — দাশরথি রায়

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'কেশবে' শব্দটিকে না ভাঙলে এর অর্থ কৃষ্ণ। শব্দটিকে 'কে' - 'শবে' এই দুটি অংশে ভাঙলে এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় — 'মৃতদেহের ওপর কে?' এর নিহিত অর্থ 'শবরূপী শিবের ওপর দাঁড়িয়ে যে নারী, তিনি কে?' এর উত্তর 'কালী'। আর 'কেশবে' অর্থ কৃষ্ণ। 'কেশবে' শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ আর ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া গেল বলে এটি সভঙ্গ শ্লেষ।

২১.৩.৪ বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরণের শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোক্তি অলংকার।

(বক্তা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি।)

১। 'বক্রোক্তি' (বক্র + উক্তি) অর্থ বাঁকা কথা। কথায় সৌন্দর্য ফোটানোর লক্ষ্যেই এ বক্রতা আবশ্যক। উক্তির এই বক্রতা সৃষ্টির জন্য কবিরা দুটি কৌশল প্রয়োগ করেন — একটি 'কাকু' বা কণ্ঠভঙ্গি, আর একটি 'শ্লেষ' বা দ্ব্যর্থকতা (কথাটির দুটি অর্থ)।

২। বক্রোক্তির প্রথম লক্ষণ, বক্তার তরফে বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা। 'কাকু' বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যেই কথায় বক্রতা আনা যেতে পারে। ভঙ্গিটা যদি এমন হয় যে, হাঁ-প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্য দিয়ে হাঁ-বোধক বক্তবা প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু-বক্রোক্তি।

৩। বক্রোক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বক্তা যে কথাটি প্রয়োগ করেছেন তার দুটি অর্থ — একটি বক্তার অভিপ্রেত

অর্থ, অন্যটি শ্রোতার গৃহীত অর্থ। অতএব, কথাটির প্রয়োগে শ্লেষ আছে। দেখা যায়, শ্লেষের সুযোগ নিয়ে শ্রোতা প্রতিবারই কথাটিকে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিচ্ছেন, অভিপ্রেত অর্থটি বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্য তৈরি হতে থাকে। এরই নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

প্রকারভেদ

বক্রোক্তি দু-রকমের —

(ক) কাকু-বক্রোক্তি; (খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি।

(ক) কাকু বক্রোক্তি :

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবাক্যে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

(i) রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? — মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত এই চরণদুটি হাঁ-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। এর উত্তরে শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, প্রমীলা ভিখারি রাঘবকে একটুও ভয় করে না। উপলব্ধিটি না-বোধক। বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হাঁ-প্রশ্নবোধক না-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পেল বলে এখানে কাকু-বক্রোক্তি হয়েছে।

(ii) মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিন্ডতলে বহি নাই তারে? — রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'গান্ধারীর আবেদন' থেকে উদ্ধৃত গান্ধারীর এই উক্তি না-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত ('নহি' 'বহি নাই')। স্নেহ-দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বক্তব্য — তিনিও মা, দুর্যোধনকে গর্ভে বহন করার দুঃখ তিনি বরণ করেছেন। বক্তব্যটি হাঁ-বোধক। কিন্তু এটি প্রকাশ পেল বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-প্রশ্নবাক্যে থেকে। অতএব, অলংকার এখানে কাকু-বক্রোক্তি।

(খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি :

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অংলকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

বক্তা — দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন?
শ্রোতা — রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
বক্তা — বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়?
শ্রোতা — সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয়?

ব্যাখ্যা : বক্তার প্রথম কথায় 'দ্বিজ' এবং 'বারুণী' শব্দের দুটি করে অর্থ। 'দ্বিজ' শব্দের একটি অর্থ

ব্রাহ্মণ এবং 'বারুণী'-র একটি অর্থ মদ। অতএব বক্তার অভিপ্রেত অর্থ — ব্রাহ্মণ হয়ে মদ খাও কেন? 'দ্বিজ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ চাঁদ, 'বারুণী'-র অর্থ পশ্চিমদিক। শ্রোতার গৃহীত অর্থটি এইরকম — চাঁদ পশ্চিমদিকে যাচ্ছে কেন? এই অর্থ ধরেই তার উত্তর — সূর্য উঠছে, তাই চাঁদ ডুবছে। এটি বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে শ্রোতা শ্লেষের সুযোগে বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অনভিপ্রেত অন্য অর্থটি গ্রহণ করায় শ্লেষ-বক্রোক্তি হয়েছে।

বক্তার দ্বিতীয় বাক্যেও একইভাবে 'সুরাসক্ত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে বক্রোক্তি হয়েছে। 'সুরাসক্ত' থেকে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ 'সুরায় আসক্ত' বা মদখোর (সুরা + আসক্ত), কিন্তু শ্রোতার গৃহীত অর্থ 'সুরে আসক্ত' বা দেবভক্ত (সুর + আসক্ত)। বক্তার এই অনভিপ্রেত অর্থটি ধরেই শ্রোতার উত্তর — দেবসেবা ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব, এখানেও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

২১.৪ সারাংশ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটির অর্থ — 'ধ্বনি' (sound) 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি' (word)। শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, ধ্বনিমাধুর্যই শব্দালংকার। তবে অর্থের চমক কখনো কখনো ধ্বনিমাধুর্যকে সহায়তা করে। যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ মধুর হয়ে উঠলে ধ্বনিমাধুর্য বা শব্দালংকার তৈরি হয়, তা একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি শব্দ (word) বা 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি'র উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি বাক্যের উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। সুতরাং, শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই — বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বা বাক্যধ্বনি। কবিতার একটি স্তবক বা একটি চরণের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগের কৌশলে মধুর শোনায়, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার। বাংলা কবিতায় প্রধান শব্দালংকার চারটি — অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি।

অনুপ্রাস : একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের একবারের বেশি উচ্চারণ অনুপ্রাস। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের — বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনধ্বনির একবারের বেশি উচ্চারণে (বিদায় বিষাদশ্রান্ত, চলচপলার চকিত চমকে), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম না মেনে দুবার উচ্চারণে (করবী-করবী), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবারের বেশি উচ্চারণে (কুঞ্জর-গঞ্জি-মঞ্জুল, কল-কিল-কুল) বৃত্ত্যনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবারের বেশি উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস (গন্ধ-অন্ধ, শিষের-শিশির)। শুনতে একই রকম কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে শ্রুত্যনুপ্রাস (চিকন-লিখন, ছন্দোবন্ধগ্রন্থ)।

প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকেও অনুপ্রাস তিন রকমের — আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস। কবিতার চরণের বা পর্বের শুরুতে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে আদ্যানুপ্রাস (বড়ো কথা শুনি..../ জড়ো করে নিয়ে....., নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া.....)। ছত্রের, চরণের বা পর্বের শেষে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে অন্ত্যানুপ্রাস (তবে/একদিন কবে, ... পুলকে চমকি/দাঁড়াবে থমকি, আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে)। দুটি চরণের প্রতিটি শব্দে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সর্বানুপ্রাস (গগনে ছড়ায়ে এলোচুল/চরণে জড়ায়ে বনফুল)।

যমক : একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা একবার অর্থযুক্ত আর অন্যবার অর্থহীন উচ্চারণে যমক অলংকার। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের — সার্থক যমক, নিরর্থক যমক। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উচ্চারণে সার্থক যমক ('কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি ....।' প্রথম 'কীর্তিবাস' = কৃত্তিবাস, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' = যশস্বী)। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে একবার অর্থযুক্ত আর একবার অর্থহীন উচ্চারণে নিরর্থক যমক (যৌবনের বনে....।' প্রথম 'বনে' অর্থহীন শব্দাংশ, দ্বিতীয় 'বনে' অর্থযুক্ত শব্দ)।

প্রয়োগ স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের — আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক, সর্বযমক। কবিতার চরণের শুরুতে থাকলে আদ্যযমক (ভারত ভারতখ্যাত ....), মাঝখানে থাকলে মধ্যযমক (পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা), শেষে থাকলে অন্ত্যযমক (মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়), গোটা চরণ জুড়ে থাকলে সর্বযমক (কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে/কান্তারে আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে)।

শ্লেষ : একটি শব্দের একবার উচ্চারণে একের বেশি অর্থ বোঝালে শ্লেষ। শ্লেষ দু-রকমের — অভঙ্গ শ্লেষ, সভঙ্গ শ্লেষ। শব্দ না ভেঙে একের বেশি অর্থ পাওয়া গেলে অভঙ্গ শ্লেষ (মধুহীন করো নাগো তব মনঃ কোকনদে। 'মধু' = কবি মধুসূদন দত্ত, মউ।) শব্দ না ভেঙে একটি অর্থ, ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া গেলে সভঙ্গ শ্লেষ (অপরূপ রূপ কেশবে। 'কেশবে' = কৃষ্ণে, 'কে শবে' = 'মৃতদেহের ওপর কে?')।

বক্রোক্তি : কোনো কথা বাঁকাভাবে ধরলে বক্রোক্তি। বক্রোক্তি দু রকমের — কাকু-বক্রোক্তি, শ্লেষ-বক্রোক্তি। 'কাকু' বা কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে 'হাঁ' বোঝাতে 'না' বোঝাতে 'হাঁ', বললে কাকু-বক্রোক্তি ('মাতা আমি নহি?' = আমিও তো মা, 'আমি কি ডরাই?' = আমি মোটেই ডরাই না)। শ্লেষের (কথার দুটি অর্থের) সুযোগ নিয়ে সুবিধাজনক অর্থটি ধরলে শ্লেষ-বক্রোক্তি ('বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন' = বামুন হয়ে মদের নেশা কেন', 'ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবভক্তি কেন।' সুবিধাজনক দ্বিতীয় অর্থটি ধরে মদখোর ব্রাহ্মণের জবাব — 'দেবসেবা ছাড়া কারো মুক্তি নেই')।

২১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ২৮৬-এর উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. শব্দাংলকার বলতে কী বোঝায়, সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন — শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।

৩. প্রধান চারটি শব্দালংকারের নাম এবং তাদের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন — ছেকানুপ্রাস, নিরর্থক যমক, অভঙ্গ শ্লেষ, কাকু-বক্রোক্তি।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন —

(ক) পৃথিবী টাকার বশ!
(খ) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।
(গ) ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।
(ঘ) লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।
(ঙ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।
৬. সঠিক অলংকার কোনটি, লিখুন —
(ক) কবির বুকের দুখের কাব্য — ছেকানুপ্রাস না বৃত্ত্যানুপ্রাস?
(খ) আর কি শুধু আসার আশায় থাকি — যমক না ছেকানুপ্রাস?
(গ) একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু — যমক না ছেকানুপ্রাস?

২১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. শ্যামাপদ চক্রবর্তী–অলঙ্কার চন্দ্রিমা।
২. জীবেন্দু সিংহ রায়–বাংলা অলঙ্কার।
৩. সুধীন্দ্র দেবনাথ–বাংলা কবিতার অলঙ্কার।